জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে ঈশ্বরভাবনা : একটি বিশ্লেষণ

নুসরাত জাহান প্রভা*

Abstract

Rabindranath Tagore's '*Gitabitan'* may be considered as a reflex of his spiritual thoughts. 'Rabindranath Tagore' and '*Gitabitan'* these two words seem to be inseparable from each other. Every single song-lyric of '*Gitabitan'*reveals the inner thoughts of the poet. However, in the songs of the part 'Puja' (Puja parjaay), Tagore's perception of God is more vividly reflected.Tagore has beseeched God in every moment of his life with all his conviction.Tagore has not considered God only to be an entity to worship rather he has thought God to be a companion of all the events of his life. Through making a connection between the lyric and melody in the songs of '*Gitabitan'*, he has tried to conserve the notion of God's vigilance. Tagore has treated music as an inexplicable way of manifesting the existence of God. It seems he has cherished and celebrated the existence of God from the day of his birth to the last day of his life in the different forms of his writing. The blending of melody and lyric of every song of the "Puja part" of '*Gitabitan'* bears the testimony of that concept of the all-pervading presence of God. In this article, Tagore's cogitation about an incessant connection between God and humankind in the songs of the 'Pujapart' of '*Gitabitan'* will be critically analyzed. Undoubtedly, if the songs of Rabindranath Tagore are being recited and sung along with the contemplation of his thought of an inseparable connection between the Supreme Being and humankind, it will become more enriching and profound.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা গানের এক অনন্য স্রষ্টা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে গানকে তিনি এক অনন্য স্থান দিয়েছেন। তিনি প্রত্যাশা করেছেন গানের ভিতর দিয়েই তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। এই প্রত্যাশাটি তাঁর 'গীতবিতানের' বিন্যাসেও লক্ষ করা যায়। তিনি ভাববোধের দিক দিয়ে তাঁর গানকে ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন- পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র এবং আনুষ্ঠানিক। কবি তাঁর গানের ভাববোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই আমরা এই বিন্যাসটি আস্বাদন করতে পারি। পূজা পর্যায়ের গানে মূল বিষয় যে ঈশ্বর ভাবনা তা পর্যায়ের নামে প্রকাশ পেলেও কবির ঈশ্বর ভাববোধ যে সমসাময়িক যেকোনো ব্যক্তি হতে আলাদা, সে বিষয়ে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর রচিত পূজা পর্যায়ের একুশটি উপ-পর্যায়সমূহের গানের বাণী বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঈশ্বরভাবনার উপলব্ধি কী কী তা তাঁর পূজা পর্যায়ের নির্বাচিত গানের বাণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

পূজা পর্যায়ের গান পর্যালোচনা করলে তাঁর ধর্মবোধ, পথ চলার শক্তি ও মানব জীবনের উত্থান-পতনের প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। ঈশ্বরের সাথে মানব মনের যে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতিনিয়ত যোগসূত্র ঘটে সেটি এ পর্যায়ের গানের বাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান।"[১]

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঊনবিংশ শতকের দিকে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) বাঙালির কাছে উপনিষদকে উপস্থাপন করেন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সূত্র ধরে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে পেয়েছেন এক প্রকার পারিবারিকভাবেই। তবে ঠাকুর বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্মধর্মের উপাসনায় উপনিষদকে পুরোপুরি অনুকরণ না করে জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও তাঁর নিজস্ব চিন্তার প্রয়োগ, গৃহশিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রারম্ভে ব্রহ্মসংগীত রচনা এক প্রকার তাঁর দাদাদের অনুসরণে হলেও কবি এতেই পরবর্তী সময়ে বর পেয়েছিলেন। তাঁর পূজা পর্যায়ের গানে কালক্রমের সাথে সাথে বাণীর সমৃদ্ধি সেটির প্রমাণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহনের হাত ধরে নতুন ঈশ্বর ভাবনার উদয় হয়। তাঁর গানে ঈশ্বরকে 'যার'যিনি' প্রভৃতি সর্বনামে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে রামমোহন রায় যে ঈশ্বরের নৈর্ব্যক্তিক রূপ প্রকাশ করেছেন সেটি থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্তগ্রাহ্য ঈশ্বর বেশ খানিকটা দূরে। তখনের কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্তরাও সে তুলনায় স্বাধীন। সে সমাজ ও ঈশ্বরের মাঝে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন এখানে একমত প্রকাশ করেন। শতাব্দীর শেষার্ধে রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) পৃথক এক মত সৃষ্টি করলেন। শহুরে জীবন থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিলেন যিনি। তবে তিনি এসে প্রচার করলেন ভক্তির কথা- 'যত মত তত পথ'[২]। এই বাণীই নাগরিক মধ্যবিত্তকে তখন আকৃষ্ট করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) ঈশ্বরচিন্তার মূল রূপ ভক্তিকে চিহ্নিত করলেন। রামমোহন বলেছিলেন উপাসনার কথা কিন্তু বঙ্কিম জোর দিলেন ভক্তির উপর। পরবর্তী সময়ে এই ভক্তিকে তিনি নিয়ে গেলেন দেশভক্তিতে। শেষ পর্যন্ত কথা হলো- ধর্ম=দেশসেবা, ঈশ্বর=দেশ।[৩] অর্থাৎ বলা যেতে পারে বাঙালির ঈশ্বর ভাবনার এক নব রূপ উদয় হয়েছিল। এই মহান বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল রাজা রামমোহনের নতুন ধর্মদেশনার মাধ্যমেই। বাংলার এই নবজন্মের প্রত্যুষেই রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণ। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম দিকে ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ ও চর্চা একনিষ্ঠভাবে করলেও সময়ের সাথে তিনি তাঁর ঈশ্বর ভাবনাকে গুছিয়েছেন নিজ আঙ্গিকে। তাঁর সকল রচনার মধ্যে পূজা পর্যায়ের গানের বাণীতে ঈশ্বরের রূপ, মানব ও ঈশ্বরের সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ফুটিয়েছেন। তাঁর মুক্ত দৃষ্টির ঈশ্বর ভাবনার প্রকাশ হয়েছে জীবন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

১৮৯০ সালের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব তাঁর রচনাতে এসেছে। তবে (১৮৯০-১৯১০) এই বিশ বছর তিনি গ্রাম বাংলার সাথে মিশেছেন এবং সঞ্চয় করেছেন বহু অভিজ্ঞতা সাথে নিয়েছিলেন অন্য এক জীবনাচরণের রূপ। তাঁর মননে পূর্বে শুধুমাত্র নাগরিক ছকে আঁকা জীবনবোধের চিত্র ছিল তিনি সেই জায়গায় এক অন্য দেশজ জীবনের স্পন্দন অনুভব করলেন। এই স্পন্দনকে তাঁর আপন মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার এক নতুন মাত্রা এখানে যুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে ঈশ্বরকে তিনি বহুভাবে সম্বোধন করেছেন। কখনো নাথ, স্বামী, প্রভু এ সকল একজনকেই সম্বোধন করলেও ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গ বহন করেছে। লক্ষ করা যায় প্রভুর সম্বোধনটি প্রায় যুক্ত হয়েছে এক আলো ফুটে ওঠার প্রসঙ্গে। যেমন: প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার-মাঝে অমনি ফোটে তারা[৪], প্রভু, বলো বলো কবে[৫], প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে[৬], প্রভৃতি। এমনকি যেখানে আলোক প্রসঙ্গ নেই সেখানেও 'বজ্র-বেদনের' কথা ও ফুল ফুঠে ওঠার প্রসঙ্গ এসেছে।

অন্যদিকে 'নাথ' বা 'স্বামী' সম্বোধনে রাত্রির অনুষঙ্গ আকর্ষিত হয়েছে। এখানে রাত্রির মধ্য দিয়ে কবি মনের গভীর বাসনা, কামনাকে প্রকাশ করেছেন। যেমন: শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ[৭], জীবন

যখন শুকায়ে যায়[৮], গানটিতে 'হে জীবন নাথ' সম্বোধনটি বাসনা পূর্ণের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা 'রাজা' সম্বোধন পাই। এই রাজার ক্ষুদ্র সৃষ্টি হিসেবে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। আবার কোথাও 'ভৃত্য' বলে অভিহিত করেছেন।'রাজা' সম্বোধন করে তিনি যেমন তাঁর অসীম প্রতাপের বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি সৃষ্টির হৃদয়ে যে 'নাথ' হিসেবে এসেছেন সে বিষয়টিও তাঁর বাণীতে উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

'জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ- -
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ॥[৯]

২

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বলেছেন কবে গাইতে পারতেন না তা তাঁর মনে নেই সুতরাং সংগীতের সাথে তাঁর সংযুক্তি শিশুকাল হতেই। ভারতবর্ষে জন্মের সুবাদে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এসেছে বেদ-উপনিষদের প্রভাব। বেদ-উপনিষদের যুগে যেমন ঋষিগণ জানতে চেয়েছেন সংগীতের মূল কোথায় বা সংগীতের গভীরতা কোথায় তেমনি রবীন্দ্রনাথের সংগীত সাধনা বা সংগীতের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় তিনিও এর গভীরে যেতে চেয়েছেন চিরকাল। তাঁর বাণী, সুরে, ছন্দের মাঝে বিশ্ব সংগীতের রূপ প্রকাশিত।

বাণীর মাধ্যমে সংগীতকে যে এক অতি উঁচুমাত্রায় নেওয়া সম্ভব তা আমাদের সংগীতেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এমন সাধক যার হাত ধরে গানে বাণী ও সুরের একাকার হয়েছে। বাণী ও সুর দুটিই পেয়েছে মুক্তির পথ। গানের ভিতর দিয়েই হয়েছে আমাদের নিজ মনের মুক্তি । তাইতো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে॥
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে॥[১০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহে পেয়েছিলেন সুরের ভাণ্ডার যেখানে ছিল রাগ রাগিণীর সমাহার অপরদিকে পেয়েছিলেন শক্তিশালী বাণীর সন্ধান। তবে আত্মপোলব্ধি ব্যতীত এমন সংগীত রচনা সম্ভব হতো না। উপরের গানটিতে কবি মুক্তি খুঁজেছেন 'ধুলায় ধুলায়' আবার 'ঘাসে ঘাসে'। আমরা যদি চিন্তা করে দেখি যে, আলো, ধুলা বা ঘাস অর্থাৎ প্রকৃতির কোনো কিছুরই নির্দিষ্ট জায়গা নেই অর্থাৎ প্রকৃতির পুরো বিশ্বে উন্মুক্ত বিচরণ। কবি ঈশ্বরের কাছে প্রকৃতির মতো নিজ মনের মুক্তি চেয়েছেন। ভাববোধের এই জায়গাটি থেকেই কবি গানটিকে 'বিশ্ব' উপ-পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন।

৩

ব্রহ্মসংগীত রচনায় কবি নিজ বিশ্বাস ও ভাবনার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ব্রহ্মসংগীত রচনার শুরুতে কবি ধ্রুপদ ভেঙ্গে গান রচনা করেছেন অথবা হিন্দি গান ভেঙ্গে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর বাণীর প্রয়োগ এবং জটিলতা পরিহার সেই সৃষ্টিকে করেছে 'রবীন্দ্রসংগীত'।

রবীন্দ্রনাথ দেশি সংগীতের সাথে বিলেত ভ্রমণ সুবাদে বিদেশি সংগীত সম্পর্কেও বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। 'স্পেন্সরের' মত অনুসারে তিনি সংগীতকে মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশের ফলে কণ্ঠ-

নিঃসৃত বিভিন্ন স্বরকে বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র।"[১১]

দেশি ও বিদেশি সংগীতের তুলনা করে তিনি দেশি সংগীতকে রাতের সংগীত অর্থাৎ'গম্ভীর' এবং সকালের সংগীত বাস্তব জীবনের সংগীত বলেছেন। সংগীত নিয়ে এমন চিন্তার পরিবর্তন তাঁর 'সংগীত' নামক প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে। লন্ডনের 'ক্রিষ্টল-প্যালেসের' গীতশালায় হ্যাণ্ডেল উৎসবে কবি যোগ দেন এবং সেখানের পরিবেশনা উপস্থাপন করেন-"গায়কেরা উদারা মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বসিয়াছে। একই রঙের একই রকমের কাপড়; সবসুদ্ধ মনে হয় প্রকাণ্ড একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশমের বুনানি করিয়া গিয়াছে। ... এত বড়ো একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার গড়িয়া তুলিলে সেটা যে একটা যন্ত্রের জিনিস হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ এই সংগীতে 'শক্তি' দেখেছেন তবে লীলা বা রসবোধ দেখেননি। যেই রসবোধটি তিনি আমাদের কীর্তনে দেখেছেন। কীর্তনের বাণী ও সুরের মিশ্রণে যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয় সেটি কবির কাছে এক অনন্য সৃষ্টি বলে মনে হয়েছে। তিনি সমস্ত সংগীতের রসবোধে মুগ্ধ হয়ে তা তাঁর ঝুলিতে ভরেছেন।এর মধ্যে কীর্তনের নাটকীয়তাকে সংগীতের একটি বিশেষ সৃষ্টি হিসাবে তিনি দেখেছেন। এই প্রেরণায় তিনি তাঁর বাণী ও সুরের মাঝে এক অটুট সম্পর্ক রেখেছেন এবং প্রতিনিয়ত বাণী ও সুরের যুগল সাধনা করে গেছেন।

৪

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আলোচনা হলেও রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের ঈশ্বর ভাববোধের সাথে প্রকৃতি, মানবমন, বিশ্ব অর্থাৎ পার্থিব বিশ্বের যে সংযুক্তি রয়েছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে সর্বাত্মক আলোচনা হয়নি।রবীন্দ্রনাথের ভক্তি চেতনার যে পরিচয় তাঁর বহুশত পূজার গানে ছড়িয়ে আছে তার মূল্যায়ন অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে বলে মনে হয়।রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে অসংখ্য হিন্দি গানের সুর ভেঙ্গে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এক আনন্দময় প্রতিযোগিতার মধ্য দিযে যদুভট্টের গান বাংলায় রূপান্তরিত করতেন।

*সোনার তরী*র 'বৈষ্ণব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে।[১৩]

তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাকে দেবতার বেদীতে অর্ঘ রূপে নিবেদন করেছেন। ঠাকুরবাড়িতে ব্রহ্মসংগীত রচনা নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মবোধ ও কর্তব্যের জন্য নয় বরং গীতি আন্দোলনের এক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। গানের বাণী ও সুরে কবি দেব চরণে আত্মনিবেদন করেছেন।

যদুভট্টের 'রুমঝুম বরখে আজু বাদরবা পিয়া বিদেশ মোরি'[১৪] এই প্রেমের গানটির সুর নিয়ে কবি রচনা করেছেন-

শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে--
ফিরি হে, দ্বারে দ্বারে--
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে॥[১৫]

প্রভাবিত সুরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ ঈশ্বরভাবনা সাজিয়েছেন। এখানে কবির ভক্তি প্রবলভাবে প্রকাশিত। ব্রাহ্মসমাজের গানে ছিল বৈরাগ্য, তত্ত্বকথার সংযুক্তি সেখান থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্যায়ের গানে এনেছেন মমতাগভীর প্রীতির মিশ্রণে ঈশ্বরের সাথে মানবমনের সংযুক্তি।

গীতাঞ্জলি রচনার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত ছাড়া বাকি সংগীতকে আধ্যাত্মিক সংগীত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ সে সকল গানে ঈশ্বরের সাথে তাঁর একান্ত বহুবিধ রূপের প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতি ছিল নিবিড় অনুভবের বিষয়, তত্ত্বের নয়।

বাউলের 'মনের মানুষ' সন্ধানের সাধনা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। 'আমি কোথায় পাব তারে' 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানগুলির উল্লেখ তিনি জীবনের নানা সময়ে করেছেন।[১৬] গীতবিতানের পূজা পর্যায়ের অনেক গানে কবি 'মনের মানুষ' রূপক হিসেবে বাণীতে এনেছেন। এজন্য পূজা পর্যায়ের উপ-পর্যায়ে 'বাউল' শিরোনামটি স্পষ্টভাবেই যুক্ত হয়েছে। 'মনের মানুষ' নিয়ে কবি লিখেছেন-

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে॥[১৭]

'গান' উপ-পর্যায়ে কবি লিখেছেন-

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে-
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে॥
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী-
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে।[১৮]

এখানেও 'আমি পাইনে তোমারে' অর্থাৎ ঈশ্বরের রূপকে মনের মানুষ খুঁজে পাওয়ার যে ব্যাকুলতা সেটি প্রকাশ পেয়েছে।

'বন্ধু' উপপর্যায়ে রচিত গান-

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে
ও বন্ধু আমার !
না পেয়ে তোমার দেখা,
একা একা দিন যে আমার কাটে না রে।।[১৯]

এখানে ঈশ্বরকে বন্ধু রূপে ডেকেছেন কবি। দেখা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল,আবার অপর গানে জীবনের লীলা খেলায় ঈশ্বরের প্রভাব নিয়ে লিখছেন-

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলাতব--
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব ॥[২০]

ঈশ্বরের নিকট 'প্রার্থনা' সূচক গানে কবি লিখেছেন-

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান ॥[২১]

কবি ঈশ্বরের নিকট এই ভুবনে স্থান চেয়েছেন সাথে চেয়েছেন 'চেতনা' যাতে প্রেমের দ্বারা আমিত্ব ঘুচে যায়।

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে ॥[২২]

এই গানের বাণীতে কবির সকল লালসা বর্জন করে যাতে ঈশ্বরের ভৃত্য রূপে কল্যাণকর কাজ দিয়ে অবস্থান করতে পারেন সেটি প্রার্থনা করেছেন।

'বিরহ' উপ পর্যায়ে কবি রচনা করেছেন-

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।।[২৩]

কবি ভাঙা মন্দিরের গভীর অন্ধকার থেকে ঈশ্বরকে ডেকেছেন। ফুল ফুটবার যেখানে বিন্দু মাত্র আশা নেই এমন বিরহ পরিস্থিতিতে ও কবি ঈশ্বরকে সেই বেদনা ভরা উপহারটুকু দিতে চেয়েছেন।

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে, মোর পাথারে হোস নে দিশেহারা।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের এই গানে সাধনা ও সংকল্প ফুটে উঠেছে। সকল বিষাদেও দিশেহারা না হয়ে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখার বার্তা রয়েছে। আকাশের গভীর অন্ধকারে যেমন ধ্রুবতারা জ্বলে আমাদের জীবনেও শত গভীর বিপদে সাধনা ও সংকল্প পারে জীবনের গতিপথকে পরিবর্তন করতে।

রবীন্দ্রনাথ 'দুঃখে'র গানে সংকলন করেছেন-

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে ॥[২৫]

দুঃখকে কবি পরশমণি হিসেবে সূচিত করেছেন। এর দহনে পুণ্য হয় জীবন অর্থাৎ দুঃখকে কবি মুক্তির পথ হিসেবে দেখেছেন।

'আশ্বাস' উপ-পর্যায়ে নিবন্ধিত গান-

'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে--
দূরে রব কত আপন বলের ছলে ॥[২৬]

শত হারকে পেরিয়ে ঈশ্বরকে জয় করার আশ্বাসের বার্তা কবি দিয়েছেন। আশা করেছেন শূন্য হৃদয়েও চেষ্টার ফলে গান বেজে ওঠে, তেমন করে অল্প দুঃখে ভেঙ্গে না পড়ে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সামনে চলার বার্তা দিয়েছেন।

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে ॥[২৭]

'অন্তর্মুখে' উপপর্যায়ের এই গানে কবি মনের সকল দ্বারকে উন্মোচিত করতে বলেছেন। কবি হৃদয় ভরে ঈশ্বরের আরাধনা রেখেছেন অর্থাৎ সমস্ত পার্থিব চাওয়ার উর্ধ্বে ঈশ্বরকে স্থান দিয়েছেন। যেন সকল দৃশ্যত স্থানে না মিললেও হৃদয়ের আলোতে ঈশ্বর থাকে স্পষ্ট।

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে ॥
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে।[২৮]

রবীন্দ্রনাথ এখানে ঈশ্বরকে প্রাণসখা রূপে ডেকেছেন। দুঃখ দূর করে নব জাগরণের পন্থা চেয়েছেন তিনি।

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার-আজ লব তাঁর দেখা।[২৯]

রবীন্দ্রনাথ সাধক হিসেবে নিজেকে এঁকেছেন। তিনি জীবনের পথ চলার মাঝেই সাধকের উপস্থিতি এনেছেন। উপাসনার আচারে নয় বরং জীবনের আলোতে তিনি ঈশ্বরকে খুঁজেছেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টির অপার জগতে যে আনন্দধারা চলে সেই ভাবনা থেকে রচনা করেছেন-

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভোমাঝে আনাদি রব,
জাগে অগন্য রবিচন্দ্রতারা।[৩০]

ভক্তমনের বাক্যহারা বিস্ময় এই অখণ্ড ব্রহ্মণ্ডের স্রষ্টার প্রতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আনন্দ উপপর্যায়ে গানটি যুক্ত করেছেন।

ঈশ্বরের মাতৃরূপকে আরাধনা করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ দেবীকে নির্দিষ্ট না করে জননী সম্বোধনে পূজা পর্যায়ে গান রচনা করেছেন।

১. জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু, আজি এ অরুণকিরণরূপে ॥[৩১]

২. আঁখিজল মুছাইলে জননী অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা ॥[৩২]

৩. তিমির দুয়ার খোলো এসো, এসো নিরবচরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণকিরণে ॥[৩৩]

৪. তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার ॥[৩৪]

৫. আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি ॥[৩৫]

৬. বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী ॥[৩৬]

৭. সন্ধ্যা হল গো, ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো ॥[৩৭]

৮. আমার আঁধার ভালো, আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে ॥[৩৮]

এ সকল গানেই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রকাশ দেখা যায়। প্রথম দুটি গানে করুণাময়ী জননীর বর্ণনা। তৃতীয় গানে জননীর নিকট জীবনের আঁধার ঘুচাবার প্রার্থনা। চতুর্থ গানে রয়েছে বেদনার্ত সন্তানের দুঃখ-সাধনার গর্ববোধ। পরবর্তী গানগুলিতে স্নেহময় জননীর কোলে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। তবে শেষ জীবনে কবি ঈশ্বরের মাতৃরূপ বা পিতৃরূপ থেকে ঈশ্বরকে 'বন্ধু' রূপে বেছে নিয়েছেন। এ জন্য পরিণত বয়সে তাঁর রচনায় ঈশ্বরের সাথে যোগসংযুক্তি আরো গভীর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধ রচনা সামগ্রী নিয়ে বহু গবেষণা এবং আলোচনা সম্ভব। তবে যে আদর্শে এবং যে প্রেরণায় লেখক তাঁর বাণীকে সমৃদ্ধ করেছেন সেটি অনুধাবন করতে পারলে তাঁর রচনার মূল ভাববোধ আস্বাদন করা সহজতর হবে।

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে যেমন স্থান পেয়েছে ঈশ্বরের অবস্থান তেমনি তাঁর অন্যান্য রচনাতে নানান আঙ্গিকে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের যেমন বহু আপন মানুষের আগমন ঘটেছে আবার তাদের সাথে ছন্দ পতন ও ঘটেছে তাঁর। তবে সমগ্র ভাবনায় তিনি আশ্রয় নিয়েছেন ঈশ্বরের। ঈশ্বরকে তিনি কখনও জগতের 'রাজা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আবার কখনও 'বন্ধু' হিসেবে সম্বোধন করেছেন। কোথাও চেয়েছেন মাথা নত করবার প্রার্থনা আবার কোথাও বিপদ থেকে রক্ষা না করে বিপদকে মোকাবেলা করার শক্তি চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের বাণীতে ঈশ্বরের সাথে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কের সেই প্রকাশটিই ঘটেছে। এ বিষয়গুলি অনুধাবনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান পাঠ করলে বা পরিবেশন করলে তা অধিকতর সমৃদ্ধ ও গভীর হবে বলে ধারণা করা যায়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪২১), পৃ. ১২

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আলো-আঁধারে সেতু* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪), পৃ. ৭৫

৩. তদেব, পৃ. ৭৬

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪১২), পৃ. ১৯

৫. তদেব, পৃ. ২৮

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৮৯), পৃ. ৫০

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩১৭), পৃ. ২২৮

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

১০. তদেব, পৃ. ১৪১

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯৬), পৃ. ৩

১২. তদেব, পৃ. ৮১

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪১০), পৃ. ৩১৮

১৪. ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, *রবীন্দ্রস্মৃতি* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৮০), পৃ. ১৮

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিমাল্য*(কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩১৭), পৃ. ৩৩৯

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিমাল্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষড়বিংশ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৬৫), পৃ. ৪৯৬

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৮৯), পৃ. ২৩৭

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতালি* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৮৯), পৃ. ৩৭৩

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিমাল্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড(কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৬৭), পৃ. ১৩৮

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪১২), পৃ. ১৯৭

৩৩. তদেব, পৃ. ১৮৪

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৩৬. তদেব, পৃ. ৮৩১

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিমাল্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭